

ভূমিকা

এই বিশ্ব-পৃথিবীতে যে আমরা রয়েছি, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বহুবিধ। জীবন ধারণের জন্য এই প্রকৃতি থেকে যেমন আমরা উপকরণ সংগ্রহ করছি। তেমনি সকল রকম প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমরা যেসব কিছু নির্মাণ করছি তার জন্যও নিয়ত আমরা প্রকৃতির সংস্পর্শে আছি। কিন্তু এসব ছাড়াও রয়েছে আমাদের মন। আর সেই মনের জন্য খোরাকের প্রয়োজন। মন বিভিন্ন বিষয়ে নানা যুক্তির খোঁজ করে চলেছে, যা তার ধর্ম। মনকে একধিক তথ্যের সন্মুখীন হতে হয়। নানা রকম বিষম বস্তুর মধ্যে ঐক্যবিধানের সূত্রটি মন যখন পায় না, তখন সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। মানুষের মনের গঠন এমনই যে সে কেবল তথ্যানুসন্ধান করে না, সেই তথ্যগুলির সংযোগসূত্র খুঁজে বার করার নিয়ত প্রচেষ্টায় রত থাকে। এছাড়া আমাদের মধ্যে রয়েছে আর এক মানুষ। সে শারীরিক নয় কেবল, ব্যক্তিগত মানুষ। সেই ব্যক্তি মানুষকে খুশি করবার জন্যই সে বিশ্বপ্রকৃতির সংস্পর্শে আসে। কিন্তু আরো একটি জগৎ আছে যাকে আমরা অনুভব করি। তা হল কবির মতে আর্টের জগৎ। মানুষ আর্টের জগৎ স্বরূপকে ঠিকমতো না জেনেই সেই আর্ট থেকে আনন্দ লাভ করে থাকে। মানুষের হৃদয়ে সৃষ্ট অনুভূতির যখন অভিব্যক্তির পথ খোঁজে তখন আর্টে শিল্পকলায় মানুষ নিজেকে প্রকাশ করে। আর্টিস্ট রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে সাহিত্য, সংগীত ও শিল্পকলা ছিল সহজাত প্রবৃত্তি। যে পরিবেশে তিনি বড়ো হয়েছিলেন সেখানে বেশিরভাগ মানুষেরই স্বাভাবিক শিল্পক্ষমতা ছিল। গোঁড়া বিশ্বাস থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার দরুণ সমাজ কবির পরিবারকে একঘরে করে রেখেছিল। তারফলে ঠাকুর পরিবারের যে নিজস্ব প্রতিবেশ গড়ে উঠেছিল তা কবির শিল্পী স্বভাব বিকাশে সহায়ক হয়েছিল। ছোটবেলায় ভূতমহলে যে পরিবেশে কবি বড়ো হয়েছিলেন সেখানে নিয়মিত রামায়ণ মহাভারতের চর্চা হত। আমরা রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’-র স্মৃতিচারণায় দেখেছি কীভাবে ভূতরা কবিদের রামায়ণ, মহাভারত পাঠ করে শোনাত প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা। এমনকি কবিদের একটি নির্দিষ্ট স্থানে শিষ্টভাবে বসিয়ে রাখার জন্য মহাকাব্যের বিভিন্ন ঘটনার বিষয়কে উপায় হিসেবে অবলম্বন করা হত। যেমন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে রেখে চারপাশে গন্ডি কেটে দেওয়া। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের যাপনের মধ্যে ‘রামায়ণ’, ‘মহাভারত’ যেভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে বিভিন্ন ভাবে এসেছে রামায়ণ এবং মহাভারতের প্রসঙ্গ। আপামর ভারতীয়ের একান্ত প্রিয় এই মহাকাব্য দুটির সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের আত্মিক সম্পর্ক বর্তমান ছিল। সেকালে কলকাতায় একমাত্র ঠাকুর পরিবারে মহর্ষির প্রবর্তনায় প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চা ছিল। স্বয়ং পিতার কাছে মহর্ষি বাল্মীকির স্বরচিত অনুষ্ঠুভ ছন্দে রচিত রামায়ণ পাঠের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই জানিয়েছেন তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ শিল্পচর্চার অনুকূল

হওয়ায় বহু প্রতিভাধর মানুষ একত্রিত হতেন। রবীন্দ্রনাথের বিলেত যাবার আগে থেকেই বাড়িতে মাঝে মাঝে ‘বিদ্বজ্জনসমাগম’ নামে সাহিত্যিকদের সম্মেলন হত। সে সম্মেলনে গীতবাদ্য, কবিতা-আবৃত্তির আয়োজন থাকতো। বোঝা যায় এক ধরনের শিল্পচর্চার মহলে রবীন্দ্রনাথ মানুষ হয়েছিলেন। আসলে বাল্যকালে যা পড়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন সারাজীবনেও সেই মুগ্ধতা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করেননি। বরং রামায়ণ ও মহাভারতের ভিন্ন ভিন্ন উপাখ্যান বা কাহিনিকে তিনি বিভিন্ন সময়ে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে স্মরণ করেছেন। কাব্য হিসেবে এদুটির মহত্ব এবং এর কাহিনির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে রবীন্দ্রনাথ তা কাজে লাগিয়েছেন তাঁর প্রিয় মহাকাব্য দুটি পড়া এবং ব্যাখ্যার জন্য। রবীন্দ্র সাহিত্যের একটি বড় জায়গা যে এই দুই মহাকাব্যের প্রশস্তি এবং এ দুটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে, তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন উপকাহিনি ও প্রধান ঘটনা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ রামায়ণ এবং মহাভারতের নানা মহৎ চরিত্রসমূহকে স্মরণ করেছেন নানা সময়ে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতির মূল রসদকে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন এবং সারাজীবন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সেই রসদকে তাঁর সাহিত্যে নানাভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির মূল যে আদর্শ তা সবসময় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। অতীত ভারতের ঐতিহ্যপূর্ণ ধারা রবীন্দ্রনাথের মনে যে আবেগের সঞ্চার করেছিল তা তাঁর বিভিন্ন রচনায় সেই সাক্ষ্য বহন করেছে। এই যে ভারতীয় ঐতিহ্যের ভাবধারা রবীন্দ্রনাথ আয়ত্ত্ব করেছিলেন তার গতিপথ জানতে হলে সেই সময়ের দাবীকে অস্বীকার করলে আমাদের চলবে না। ভারতবর্ষে সে সময় নিজেদের অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে জানার আগ্রহ তৈরীর পিছনে বিদেশীদের একটা ভূমিকা অবশ্যই আমাদের স্বীকার করতে হবে। যে সকল বিদেশীদের প্রচেষ্টায় ভারতের অতীত ইতিহাস এবং সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছিল তারা হলেন স্যর চার্লস উইলকিন্স, স্যর উইলিয়ম জোন্স, এইচ. টি. কোল ব্রুক প্রমুখ। ১৭৮৫ সালে উইলকিন্স, ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহে ভগবদ্গীতার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এরপর স্যর উইলিয়ম জোন্স এর উদ্যোগে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি চর্চার উদ্দেশ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়। অন্যদিকে শ্রীরামপুর মিশন বিদেশী সৈনিকদের দেশীয় ভাষা ও আইন শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন করেন। এইভাবে কিছুটা নিজেদের স্বার্থে আবার কিছুটা আগ্রহের বশবর্তী হয়ে ভারতের প্রাচীন ইতিহাস তথা সাহিত্যচর্চার সূচনা হয়। ক্রমে ভারতবাসীর মধ্যে দেশের অতীত গৌরবের অধ্যায়কে নতুন করে জানার একটা চেতনার সঞ্চার ঘটে। আবির্ভাব ঘটে ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের। একদিকে রামমোহন রায় (১৭৭২—১৮৩৩) হিন্দু ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। তিনি ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রের আলোচনা করতে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতের প্রাচীনপন্থীরা এটিকে মেনে নিতে পারলেন না। তাদের মধ্যে

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮) ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসেন। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেন। রামমোহনের অনুগামীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)। প্রথম জীবনে তিনি রামমোহনের অনুসরণ করলেও পরবর্তীতে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হন এবং আলাদাভাবে ১৮৬৬ সালে ‘ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ’ স্থাপন করেন। এই সময়পর্বেই রামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-১৮৮৬) এবং তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানে অগ্রণী ভূমিকা নেন। এছাড়া ভারতীয় ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। যিনি অনুভব করেছিলেন ভারতীয় দর্শন, ইতিহাস, পুরাণ সাহিত্য এগুলির অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা। এরপর আবির্ভাব হয় বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪)। তিনি বুঝেছিলেন বাঙ্গালীর কোনো আদর্শ নেই। তাই আদর্শ চরিত্র নির্মাণের জন্য ভারতের পুরাণ এবং ইতিহাসের স্মরণাপন্ন হন তিনি। এইরকম ধর্মীয় ও সামাজিক আলোড়নের সমকালে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ঘটে। তাই এই পরিবেশ রবীন্দ্রমানস গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ঠাকুর পরিবার সেসময় দেশীয় ঐতিহ্যের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা এবং চেতনার পরিচয় দিয়েছিল। সেসময় ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র ছিল ঠাকুরবাড়ি। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মানস গঠনে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মূলত পরিবারের সংস্পর্শেই তিনি সাহিত্য রচনার প্রণোদনা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর স্মৃতিচারণায় বলেছেন ঠাকুরবাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বইত। তিনই যেসকল মানুষদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের চিন্তা চেতনা কবির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। তাদের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)-এর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করেছিলেন। এছাড়া বিহারীলাল চক্রবর্তী, যিনি কালিদাস এবং বাল্মীকির কবিত্বে মুগ্ধ ছিলেন, তিনি কবির সাহিত্যসঙ্গী হওয়ার দরুণ প্রাচীন এই কবিদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকি তাঁর রচনার দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এই দুই মহাকাব্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের সূত্রেই নানাভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে উঠে এসেছে রামায়ণ-মহাভারতের প্রসঙ্গ। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সাহিত্যিক পরীক্ষা নিরীক্ষায় রত থেকেছেন তিনি। আর এই রবীন্দ্রকৃত সাহিত্যিক পরীক্ষাকে অ্যাড্যাপ্টেইশন্ তত্ত্বের আলোকে দেখতে আমি অগ্রসর হয়েছি। পাশ্চাত্য তুলনামূলক সাহিত্য সমালোচনার ধারায় অ্যাড্যাপ্টেইশন্ তত্ত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর সেক্ষেত্রে প্রথমেই যে বইটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা জরুরী তা হল লিভা হাচিওন-এর ‘এ থিয়োরি অফ অ্যাড্যাপ্টেইশন্’ বইটি। এই বইতে লিভা অ্যাড্যাপ্টেইশন্ থিওরিকে নানা ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। এই গ্রন্থে লিভা বলছেন অ্যাড্যাপ্টেইশন্ হল মূলের যথার্থতা রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যুগ্মভাবে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির

ব্যাখ্যা এবং নতুন কিছু সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, অ্যাডাপ্টেশন্স হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা মূলের নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করে নতুন সৃষ্টি লাভ করে। তৃতীয়ত, তিনি অ্যাডাপ্টেশন্সকে একই সঙ্গে প্রক্রিয়া এবং সৃষ্ট বস্তু হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি বলছেন অ্যাডাপ্টেশন্স কখনই গৌণ নয় বরং এটি একটি স্বতন্ত্র সৃষ্টি। এই অ্যাডাপ্টেশন্স প্রক্রিয়ায় রিসেপশন্স হল প্রাথমিক পর্যায়। একজন লেখক যখন কোন টেক্সটকে দেখেন বা পাঠ করেন তখন সেই টেক্সটটিকে কীভাবে পাঠের মধ্য দিয়ে আত্মীকরণ করেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আর সেক্ষেত্রে লেখকের সমসময়, স্থান বা পরিবেশ এবং লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। রবীন্দ্রকৃত সাহিত্যিক পরীক্ষাকে অ্যাডাপ্টেশন্স তত্ত্বের আলোকে দেখতে আমি অগ্রসর হয়েছি। বর্তমানে সাহিত্য অধ্যয়নের ক্ষেত্রে পরিভাষার মৌলিক প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। সংস্কৃতির বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে সাহিত্যের অবস্থান। বিভিন্ন সংস্কৃতির সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক ইন্টারডিসিপ্লিনারি অধ্যয়নের প্রেক্ষাপটে আলোচিত হয়ে থাকে। তাই অ্যাডাপ্টেশন্সের অর্থ ও বাংলা প্রতিশব্দকে খুঁজে নিতে বিভিন্ন অভিধানের সাহায্য আমরা নিয়েছি। আমার প্রথম অধ্যায়ে থাকছে অ্যাডাপ্টেশন্স থিয়োরির আলোচনা। যেখানে আমরা আলোচনা করেছি অ্যাডাপ্টেশন্স বলতে কী বোঝায়। সেইসঙ্গে থাকছে অ্যাডাপ্টেশন্সের অর্থানুসন্ধান, যাতে বাংলা পরিভাষায় এটির কোন শব্দটি গ্রহণীয় হতে পারে থাকছে তার বিশ্লেষণও। এছাড়া লিভা হাচিওন-এর ‘এ থিয়োরি অফ অ্যাডাপ্টেশন্স’ বইটির আলোকে আমরা অ্যাডাপ্টেশন্স কী তা যেমন আলোচনা করেছি সেইসঙ্গে কোনটি অ্যাডাপ্টেশন্স না হয়ে কেবল রিসেপশন্স হচ্ছে সে নিয়েও আলোচনা করেছি। সেই সঙ্গে অ্যাডাপ্টেশন্স তত্ত্বের বিশেষ দিক এবং তার প্রাসঙ্গিকতাও আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র মননে কীভাবে রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্যের স্থায়ী জায়গা করে নিচ্ছে তার আলোচনায় রত হয়েছি। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরিবেশ, প্রতিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই দুই মহাকাব্যের স্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা থাকছে এই অধ্যায়ে। সেইসঙ্গে ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কবির মন্তব্য, মহাকাব্য দুটির ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার এবং এই দুই মহাকাব্যের আদর্শ অনুসরণের বিষয়ে আলোচনাও থাকছে এই অধ্যায়ে। তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র কাব্যসাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের গ্রহণ ও প্রতিগ্রহণ কীভাবে হয়েছে তা দেখাতে চেষ্টা করেছি। রবীন্দ্র জীবনে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ছাপ্পান্ন। আর এই বিশাল সৃষ্টি সম্ভারের মধ্যেও দেখবো আমার আলোচ্য মহাকাব্যদ্বয়ের গ্রহণ ও প্রতিগ্রহণ। সেক্ষেত্রে প্রথম যে কবিতাটির কথা মনে পড়ে তা হল ‘কাহিনী’ (১৩০৬ ব.) নাট্যকাব্যের অন্তর্গত ‘পতিতা’ কবিতাটির কথা। ‘পতিতা’ কবিতায় স্বীকরণ হয়েছে রামায়ণের ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির উপাখ্যানভাগের। রবীন্দ্রনাথ যখন ঊনবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে নারীকে ব্যবহার করার প্রবণতা সেই রামায়ণের যুগের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ করেন তখন কোথাও যেন কালের নিয়মে নারীর

অবস্থার যে খুব একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেনি – তা অনুভব করতে অসুবিধে হয় না। মেয়েটি পতিতাবৃত্তি করছে বলে সেটিই তার শেষ পরিচয় হতে পারে না। কবিতায় বর্ণিত নবীন কিশোর তপস্বী সেই মেয়েটির হৃদয়ের পরিচয় উপলব্ধি করে। মেয়েটি এই প্রথম কোনো পুরুষের চোখে লালসার পরিবর্তে নিজেকে নারী হিসেবে দেখতে পায়। অন্যদিকে এই ‘কাহিনী’ (১৯০০ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘ভাষা ও ছন্দ’ কবিতায় বাল্মীকির কবিত্বলাভের প্রতি সহজাত আকর্ষণের পরিচয় পাই। এরপরেই যে রবীন্দ্রকবিতাটির নাম আমরা উল্লেখ করতে পারি তা হল ‘চিত্রা’ (১৮৮৫ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ‘নগরসংগীত’ কবিতাটি। ‘নগরসংগীত’ কবিতায় সম্পূর্ণ অন্য পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করলেন রামায়ণের মায়ামৃগের পরিকল্পনাকে। এছাড়া মনে পড়ে ‘সোনারতরী’ (১৮৯৩ খ্রী.) কাব্যগ্রন্থের ‘পুরস্কার’ কবিতাটির কথা। আমি আমার গবেষণার মধ্য দিয়ে ক্রমশ দেখবো কীভাবে রবীন্দ্র কবিতায় রামায়ণ এবং মহাভারতের অ্যাড্যাপ্টেইশন্ বা প্রতিগ্রহণ হচ্ছে এবং তার অনুসন্ধান রত হব।

চতুর্থ অধ্যায় ‘রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ’। রবীন্দ্র জীবনে নাট্যসাহিত্যের সংখ্যা আনুমানিক পঁয়ষট্টি। যার মধ্যে রয়েছে কাব্য-নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য ও নাট্য-কবিতা। রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা অবগত হই যে এই নাট্যসংরূপ গুলোর মূলেও ছিল ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারতের’ নানা কাহিনির প্রণোদনা। গীতিনাট্য ‘বাল্মীকিপ্রতিভা’-য় যেমন আমি দেখতে পাই রামায়ণে দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিতে বদলে যাওয়ার কাহিনি গৃহীত হয়েছে কিন্তু মূলে পটভূমি ইত্যাদি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু মূল গল্পাংশটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অতিরিক্ত মাত্রা যোগ করলেন যেমন নাট্য সংস্থান, অভিনয় প্রণালী, নাট্য-চরিত্র ইত্যাদি। করলেন সুরের এক নতুন পরীক্ষা, সংযুক্ত হল রবীন্দ্রনাথের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এই ভাবে এই অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র নাটকগুলিতে রামায়ণ ও মহাভারতের গ্রহণ আলোচনার পর উল্লিখিত সংরূপগুলিতে কীভাবে তা অ্যাড্যাপ্টেইশন্ হচ্ছে থাকবে তার বিস্তারিত আলোচনা।

পঞ্চম অধ্যায় ‘রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাস রচনা করেছেন তেরোটি। আর এই উপন্যাসগুলিতে নানাভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে ‘রামায়ণ’ ‘মহাভারত’ এর প্রসঙ্গ। সেই সাথে উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আধুনিক ব্যাখ্যা এবং তার স্বকীয় রূপায়ণ। প্রথমে যে উপন্যাসটির কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে তা হল ‘ঘরে বাইরে’ (১৯১৬ খ্রী.) উপন্যাস। সেখানে কিরাতবেশী মহাদেবের সাথে অর্জুনের লড়াইয়ের প্রসঙ্গ এনে রবীন্দ্রনাথ বলছেন যে ভগবানকে একদিক দিয়ে মারার মধ্য দিয়েই আমরা তাকে প্রসন্ন করতে পারব। অন্যদিকে দময়ন্তীর প্রসঙ্গ এনে বলছেন দময়ন্তী স্বয়ংবরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিল কিন্তু বিমলারা স্বয়ংবরা হতে পারেনি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্ছে। জীবনের

ট্রাজেডিকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন লঙ্কাকাণ্ডের ঘটনাকে ভিন্ন ব্যাখ্যায় উপস্থাপন করে। তাঁর মতে রাবণের মনে সংকোচ ছিল বলেই সীতাকে হরণ করে এনে অশোকবনে রেখছিলেন, আর সেই সংকোচটুকু ছিল বলেই যে বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল তাকে দয়া ও অবজ্ঞা করে নিজের মৃত্যুকেই তিনি সুনিশ্চিত করেছিলেন। অন্যদিকে ‘চার অধ্যায়’ (১৯৩৪ খ্রী.) উপন্যাসে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রসঙ্গ এনে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন নির্দয় হোয়ো না, কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে। বলা বাহুল্য অপ্রয়োজনে উক্ত ঘটনাগুলি সেখানে উপস্থিত হয়নি। মূল বক্তব্যের জন্য অথবা নিজের ভাবকে ব্যক্ত করার প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত মোট গল্পের সংখ্যা আনুমানিক ১১৯টি। আর এক্ষেত্রে প্রথমেই মনে পরে ‘গল্পগুচ্ছ’ এর অন্তর্গত ‘রাজপথের কথা’ (১২৯১ ব.) গল্পটির কথা। ‘রামায়ণ’-এর অহল্যা উপাখ্যানের প্রসঙ্গ এনে রবীন্দ্রনাথ রাজপথের আত্মকথাকে ব্যক্ত করেছেন এই গল্পে। পাষণরূপী অহল্যার আর্ত হাহাকারই কি এই রাজপথের রূপকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করতে চাইছেন না? অন্যদিকে ‘জয়পরাজয়’ (১২৯৯ ব.) গল্পে রাজা যখন কবি শেখরকে পুণ্ডরীকের বিরুদ্ধে কাব্য যুদ্ধে অবতরণ করালেন তখন রবীন্দ্রনাথ কবি শেখরের প্রণয় অভিমান এবং সংকোচপূর্ণ দৃষ্টির সন্মুখে তুলে আনলেন লোকরঞ্জনোপায়ে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষায় সন্মুখ সীতাকে। এইভাবে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে কীভাবে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-র প্রতিগ্রহণ হয়েছে তার আলোচনাই থাকবে এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায় রবীন্দ্র প্রবন্ধসমগ্র ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’কে রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বিশ্লেষণের প্রধান মানদণ্ডই হল তার প্রবন্ধসাহিত্য। রবীন্দ্রনাথ যে আধুনিক দৃষ্টিতে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’কে দেখছেন তা আমাদের নতুনভাবে ভাবতে সাহায্য করে। সামগ্রিকভাবে রামায়ণ মহাকাব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবলতম দুই গোষ্ঠীর বিরোধ দেখেছিলেন। যা ছিল মূলত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয়ের মধ্যে। ‘রামচন্দ্র’ প্রমুখ ক্ষত্রিয়েরা এই দুই গোষ্ঠীর মিলনসাধনেরই চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। ‘ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা’ (১৩১৮ ব.) প্রবন্ধে মূলত এই বিষয়টিকেই তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই প্রবন্ধে রামচরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের চিন্তাভাবনার সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। অন্যদিকে ‘আত্মশক্তি’ প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত ‘স্বদেশীসমাজ’ প্রবন্ধের পরিশিষ্টে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল কর্ণ যখন তাঁর কবজ ত্যাগ করেছিল এবং অর্জুন যখন গাণ্ডীব তুলতে ব্যর্থ হন তখনই তাদের মৃত্যু এবং পরাজয় ঘনিয়ে এসেছিল। যা থেকে তিনি অনুভব করেছিলেন শক্তি সকলের এক জায়গায় নেই, কোনো দেশ অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে নিজেদের রক্ষা করে, কোনো দেশ সর্বাপেক্ষে শক্তিকবজ ধারণ করে জয় লাভ করে। এইভাবে রবীন্দ্র প্রবন্ধসমগ্রের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’-এর প্রতিগ্রহণ তুলে ধরাই হবে এই অধ্যায়ের লক্ষ্য।

আমরা রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে রামায়ণ এবং মহাভারত কীভাবে গ্রহণ এবং প্রতিগ্রহণ হয়েছে তা বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছি। সেক্ষেত্রে প্রতিটি আঙ্গিকে যেমন কাব্য, নাট্য, কথাসাহিত্য এবং প্রবন্ধসাহিত্যে কীভাবে রামায়ণ মহাভারতকে তিনি গ্রহণ করছেন এবং কীভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে তা প্রতিগৃহীত হয়েছে তাকে অ্যাড্যাপ্টেশন্ তথা গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ তত্ত্বের আলোয় বিশ্লেষণ করেছি। আমি আমার কাজের মাধ্যমে ইংরেজি যে ‘Adaptation Theory’ তাকেই বাংলায় প্রতিগ্রহণ তত্ত্বের আলোকে একটি তাত্ত্বিক রূপ দিতে চেয়েছি। এই গবেষণায় এটি যেমন উদ্দেশ্য তেমনই অপর উদ্দেশ্য সেই প্রতিগ্রহণ তত্ত্বের আলোকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে দেখতে চাওয়া। তুলনামূলক গবেষণা পদ্ধতির আধারে আমাদের এই বর্তমান গবেষণা কর্মের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ কোন অতীত কাজের প্রসঙ্গ এখনো পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্যগোচর হয়নি। তবে রবীন্দ্রসাহিত্যে রামায়ণ ও মহাভারতের আলোচিত দিকগুলির ওপর আলোকপাতের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা দেখতে পাই পম্পা মজুমদারের ‘রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস’ বইটিতে। সেইদিক থেকে অ্যাড্যাপ্টেশন্ থিয়োরির আলোকে রবীন্দ্র সাহিত্যে ‘রামায়ণ’ ও ‘মহাভারত’ – এই দুই মহাকাব্যের প্রভাবকে বুঝতে চাওয়া প্রথম মৌলিক প্রচেষ্টা।